শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা

সংশয়বাদীর শত প্রশ্ন ও গীতাধ্যানীর সদুত্তর

(চতুর্থ খণ্ড)

পার্থসারথি গায়েন

প্রভা প্রকাশনী
প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা
১কে, রাধানাথ মল্লিক লেন, কলকাতা-১২

সংশয়বাদীর শত প্রশ্ন ও গীতাধ্যানীর সদুত্তর

প্রশ্ন-১। সংশয়বাদীরা প্রশ্ন করলেন, ঈশ্বরকে আমরা দেখতে পাই না। তিনি যে আছেন তার কোনো প্রমাণও নেই। তাহলে ঈশ্বরের অস্তিত্বকে আমরা কেন স্বীকার করবো?

উত্তর : গীতাধ্যানীরা বললেন, ঈশ্বর আছেন বলেই তাঁকে আমরা মানবো। তিনি আছেন বলেই তাঁকে আমরা জানবো। তিনি বোঝবার বস্তু, বোধের বস্তু বলে আমরা তাঁকে বুঝবো। বোধে নেব। না, গায়ের জোরে নয়, গলার তোড়ে নয়—ভাবের আবেগে ভেসেও নয়। তাঁকে বুঝবো যুক্তির পারিপাট্যে—হ্যাঁ, যুক্তির ঘনঘটা দিয়ে বুঝবো। বুঝবো অনুভূতি দিয়ে। অনুভব দিয়ে। বুঝবো বোধের তীব্রতা দিয়ে।

তবে কেন তাঁকে দেখতে পাই না? দেখতে তো আমরা অনেক কিছুই পাই না খালি চোখে। সোজা চোখে। তবু তো মেনে নিই আছে বলে। আমরা আমাদের শরীরের পিছন দিকে অবস্থিত পিঠকেই দেখতে পাই না। আমরা দেখতে পাই না জীবনদায়ী অক্সিজেন ভরা বাতাসকে। পৃথিবীর মূল সত্তা এ্যানার্জিকে। তারের মধ্যে অবস্থিত বিদ্যুৎকে। আমরা দেখতে পাই না আমাদের ঊর্ধ্বতন ষষ্ঠ বা সপ্তম পুরুষের প্র-পিতামহী বা প্র-পিতামহকে। তবু কিন্তু আমরা মেনে নিই। মেনে নিতে বাধ্য হই। পিঠ আছে। বাতাস আছে। বিজ্ঞানীরও না মেনে উপায় নেই এ্যানার্জি আছে বলে। প্র-পিতামহী বা প্র-পিতামহ ছিলেন, তাঁকে চোখে দেখিনি কখনও তবু মেনে নিই। কেননা, তা না হলে আমার অস্তিত্বই বিপন্ন। সুতরাং সব জিনিস স্থূল চোখে নয়—নানা মাধ্যম দিয়ে—নানা উপকরণ দিয়ে, নানা পরম্পরা ধরে মেনে নিই। জেনে যাই এঁরা আছেন বা ছিলেন। সুতরাং, 'যা দেখিনি নিজ নয়নে—তা বিশ্বাস করি না, গুরু বচনে'—বলে আমরা কিন্তু উড়িয়ে দিই না।

ঈশ্বর আছেন, ঈশ্বর দেখেছেন এমন কথা বলবার বহু মানুষ না থাকলেও বেশকিছু মনীষী এসেছেন—এদেশে এবং বিশ্বদেশেও। তাঁরা দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন—

"বেদাহমেতং, পুরুষং মহান্তং আদিত্যবর্ণং।"

সেই জ্যোতির্ময় মহান পুরুষকে আমি দেখেছি। জেনেছি। এবং এঁরা সবাই কিন্তু পৌরাণিক মানব-মানবী নন।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের বাণীতে—

"শোনো বিশ্বজন,
শোনো অমৃতের পুত্র যত দেবগণ
দিব্যধামবাসী, আমি জেনেছি তাহারে
মহান্ত পুরুষ যিনি আঁধারের পারে
জোর্তিময়,....."।

পৌরাণিক উক্তি হলে বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ হয়তো বলে দিতেন ভাবের উচ্ছ্বাস। আষাঢ়ে গল্প। মিথ্যের ফুলঝুরি বলে। এঁদের অনেকেই ইতিহাসপ্রসিদ্ধ সিদ্ধপুরুষ। নানক-কবীর, তুলসীদাস, হজরত মোহম্মদ, মীরাবাঈ, শ্রীচৈতন্য, রামপ্রসাদ, শ্রীরামকৃষ্ণ এবং আরও অনেক অনেক বিশ্ববরেণ্য ব্যক্তিত্ব। শ্রীরামকৃষ্ণদেব তো ঈশ্বর সন্ধানে উদ্‌ভ্রান্ত জিজ্ঞাসু নরেনকে ঈশ্বর উদ্ভাসে উদ্ভাসিত হয়ে বললেন—ঈশ্বরকে দেখি বই কি, তোর থেকে আরও সুস্পষ্ট করে দেখি। নরেনের তো চক্ষু স্থির। সম্ভব? এও সম্ভব? রক্তমাংসের মানুষ বলছেন—তাঁকে দেখেছি। রূপময় তাঁকে দেখেছেন?

মজার কথা হলো আমরা বহু সন্দিগ্ধ মানুষ এইসব অবতার পুরুষদের কাছে যাই। তাঁদের সাধনাস্থল মন্দির, মসজিদ, মাজারে, গুরুদুয়ারে যাই। মাথা ঠোকাই, ফুল ফল দুধ বেলপাতা দিই, প্রদীপ জ্বালাই, প্রণামী দিই। কিন্তু তাঁদের বিশ্বাস করি না। বিশ্বাসে মিলায় বস্তু, তর্কে বহু দূর। না, বিশ্বাস করতে হবে না। তর্ক করুন। ফাঁসতে হবে না অন্ধবিশ্বাসে, ভাসতে হবে না ভাবের জোয়ারে। যুক্তির কষ্ঠিপাথরে যাচাই করে নিন। ভগবান বুদ্ধ—দীপ্তকণ্ঠে বললেন, 'এ হি পসসিকো'—এসো দেখো। বোঝো। জানো। মেনে অন্ধ হয়ে তার পরে জানতে হবে না। জেনে চক্ষুস্মান হয়ে

তারপর নিজের আলোকে আলোকিত হয়ে দেখো। এঁরা যে পথ বলে দিচ্ছেন সে পথ ধরে চলো। দেখা তুমি পাবে। পাবেই। কোনো নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছোতে গেলে একটা পথ ধরে এগিয়ে যেতে হবে। তবেই যাত্রা শেষে পৌঁছে যাবে কাঙ্ক্ষিত নিশানায়। কিন্তু আমরা অধিকাংশ মানুষই অর্জুনের মতো এতদিন ধরে যে পথে যে কাম, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি আত্মীয়ের সঙ্গে চলে এসেছি, তাদের ছেড়ে যেতে হবে বলে হা-হুতাশ করছি। ঈশ্বর নেই এই অবিশ্বাস দিয়ে নিজেরাই নিজেদের সঙ্গে প্রতারণা করছি। প্রবঞ্চনা করছি। আমরা পথের মাঝে পথ হারিয়ে—এই বেশ আছি ভাবে ভারাক্রান্ত। আমরা কী চাই জানি না। কোথায় যেতে চাই সে ব্যাপারে কোনো স্পষ্ট ধারণা নেই। আমাদের নিজেদের ওপরে ভরসা করবার মতো ভরকেন্দ্র নেই। অন্যের ওপর বিশ্বাস করবার মতো শ্রদ্ধাবোধ নেই। আমাদের ভাবখানা কী—

"কীযে চায় নাহি জানে, নাহি ঘোচে তৃষা
আপনার মনোমাঝে আপনি সে হারায়েছে দিশা।"

—রবীন্দ্রনাথ

—প্রমাণ কই? প্রমাণ আছে রাশি রাশি। ভুরি ভুরি। অজস্র। প্রত্যেক সৃষ্ট বস্তু তা সে যতই ক্ষুদ্র হোক না কেন তার কোনো না কোনো একজন সৃষ্টিকর্তা বা নির্মাতা থাকবেনই। তাঁকেই আমরা বলি সেই সৃষ্টির স্রষ্টা। সৃষ্টিকর্তা ব্যতিরেকে কোনো বস্তুই সৃষ্টি হতে পারে না। তাই যদি হয় তাহলে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, আকাশ, চন্দ্র, সূর্য, তারা, পৃথিবী, নদনদী, সমুদ্রের এই সব মহান সৃষ্টির পিছনে নিশ্চয়ই একজন মহান সৃষ্টিকর্তা আছেন। তিনিই ঈশ্বর। তিনিই স্রষ্টা।

যদি বলেন এসব তো প্রকৃতির সৃষ্টি। প্রকৃতির সৃষ্টিকে খামোখা ঈশ্বর বলে কোনো অজানা-অচেনা সত্তাকে মান্যতা দেব কেন? বেশ কথা! আমরা জানতে চাই এই প্রকৃতি জড় না চেতন শক্তি? যদি বলেন প্রকৃতি জড় তাহলে বলবো জড়ের দ্বারা জীবন সৃষ্টি সম্ভব নয়। বিজ্ঞানও তা বলে। মানেও। পাহাড় ভেঙে পাথর হতে পারে কিন্তু প্রাণ সৃষ্টি হতে পারে না। Life begets life. জীবনই জীবনের স্রষ্টা। আর যদি বলেন প্রকৃতি চেতনশক্তিসম্পন্ন। যদি বলেন প্রকৃতি চৈতন্যময় শক্তি তাহলে তো মিটে গেল গোল। ঈশ্বরের অস্তিত্ব মেনে নিচ্ছেন। চেতনসম্পন্ন প্রকৃতি তো ঈশ্বরের শক্তি। এই প্রকৃতিকে আশ্রয় করেই তো ঈশ্বর সৃষ্টি করেন। গীতাতে তিনি সে কথাই বলেছেন—

"প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃপুন।
ভূতগ্রামমিং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্বশাৎ"

নবম অধ্যায়, রাজযোগ, শ্লোক সংখ্যা–৮

প্রকৃতিকে বশীভূত করে স্বভাবের অধীন এবং এই সমস্ত জন্ম-মৃত্যুর অধীন জীবগণকে আমি বারবার সৃষ্টি করি।

দ্বিতীয় কথা, মানুষ মাত্রেই অপূর্ণ। খণ্ড জীবনের অধিকারী। তাই তার পূর্ণতার প্রতি এত আকর্ষণ। তাই তার অখণ্ডের প্রতি এত টান। যদি পরিপূর্ণ পূর্ণ বলে কিছু না থাকে, যদি অখণ্ড চিৎসত্তা বলে কিছু না থাকে তাহলে এই পূর্ণের প্রতি, এই অখণ্ডের প্রতি তার টান এমন দুর্বার হতো না। এমন অপ্রতিরোধ্য হতো না। বুকফাটা তেষ্টা আছে বলে না প্রমাণ হয় তেষ্টা মেটানো পানীয় আছে। মা আছেন বলে শিশুর মায়ের প্রতি আকর্ষণ এমন মধুর। ঈশ্বর আছেন বলেই তো তাঁর প্রতি এমন টান। তিনিই ভূমা। তিনিই পূর্ণ। ঈশ্বর অখণ্ডমণ্ডলাকার।

তৃতীয়ত, কোনো মানুষ যখন অন্য কোনো মানুষকে জ্ঞানে, বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, যোগ্যতায়, ঐশ্বর্যে, সৌন্দর্যে ও শ্রীতে নিজের থেকে বড়ো বলে মেনে নেন তখন বুঝতে হবে এমন কেউ নিশ্চয় আছেন যিনি এইসব গুণের শেষতম সীমা। অর্থাৎ তিনিই শ্রেষ্ঠতম। তাঁর সমকক্ষ আর কেউ নেই। তিনিই ভূমা। তিনিই ব্রহ্ম। গীতায় একাদশ অধ্যায়ে বিশ্বরূপদর্শযোগের তেতাল্লিশতম শ্লোকে অর্জুনের উক্তি এ কথারই সাক্ষী দেয়–

"পিতাহসি লোকস্য চরাচরস্য
ত্বমস্য পূজ্যশ্চ গুরুর্গরীয়ান।
ন ত্বৎসমোহস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোহন্যো.....
লোকত্রয়েহপ্যপ্রতিমপ্রভাব।"

হে অমিত শক্তি, আপনি এই চরাচর জগতের স্রষ্টা, পূজ্য, গুরু এবং গুরুরও গুরু। ত্রিভুবনে আপনার সমান আর কেউ নেই। ত্রিভুবনে আপনার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কে হতে পারে?

শ্রেষ্ঠত্বের এই শেষ সীমাই ঈশ্বর। এই শেষ সীমাই সর্বশক্তিমান। পুরুষোত্তম।

হয়তো বলবেন অনেকে তো এখনও বলছেন ঈশ্বর বলে কিছু নেই। এর উত্তরে আমরা বলবো আবার বহু মনীষী বলেছেন যে ঈশ্বর আছেন। স্বমহিমায় আছেন। কোনো দলে না গিয়ে আসুন নিরপেক্ষ হই। আসুন ন্যায়ের পক্ষে হই। আসুন সত্যের পক্ষে হই। বিজ্ঞানীদের কথায় পরে আসছি। যাঁরা বাইরে থেকে বলছেন ঈশ্বর নেই। তাঁদের ভিত্তি কী? তাঁরা ঈশ্বর নেই প্রমাণ করলেন কী দিয়ে? তাঁরা কি 'নেই ঈশ্বর' নিয়ে ধ্যান করেছেন? ধারণা করেছেন? সাধনা করেছেন? কিন্তু যাঁরা বলছেন ঈশ্বর আছেন—তাঁদের মধ্যে অনেকেই কিন্তু সাধনাসিদ্ধ পুরুষ। বহু ধ্যানধারণা, তপ, জপ, সাধনা দ্বারা ঈশ্বরের অরূপকে রূপে ধরেছেন। এঁদের অনেকেই অতিন্দ্রীয় ক্ষমতার অধিকারী এবং তা লোকমান্যতাও পেয়েছেন। এমনকি নিরীশ্বরবাদীরাও তাঁদের শক্তির স্বীকৃতি দিয়েছেন। এই শক্তির শেষ সীমা, এই জ্ঞানেব শেষ সীমা, এই আনন্দের শেষ সীমাই ঈশ্বর। এই আনন্দের শেষ ঠিকানাই সচ্চিদানন্দ। পুরুষোত্তম।

আর বিজ্ঞানীরা? বিজ্ঞানীরা কিন্তু সমস্বরে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেননি আজও যে ঈশ্বর নেই। তাঁরা বলেন—তাঁরা এখনও ঈশ্বরের সন্ধান পাননি। জানতে পারেননি ঈশ্বরের অস্তিত্বকে। বিজ্ঞানীদের সব জানা কি শেষ হয়ে গেছে? এখনও সন্ধান পাইনি মানে নেই বলছেন না। কিন্তু আজকাল আবার অনেক বিজ্ঞানী উলটো সুরে কথা বলছেন। তাঁদের ঈশ্বর নেই বলার মতো গলার কাঠিন্য ক্রমশ দ্রব হয়ে আসছে। তাঁরা অবিজ্ঞানোচিত ভাষায় হয়তো নয়তো করছেন। আর বিজ্ঞানীদের বিজ্ঞানী অ্যালবার্ট আইনস্টাইন কী বলেছেন? বলছেন—

"There are creatures who in their grudges against the traditional religion say 'religion is the opium of the masses'—They cannot hear the music of the spheres."

অর্থাৎ যাঁরা প্রচলিত ধর্মকে জনগণের আফিম বা নেশা মনে করেন তাঁরা মহাবিশ্বের মর্মস্থল থেকে যে ধ্বনিপ্রবাহ বা ওঁকারধ্বনি প্রবাহিত হয় তাঁরা তা শুনতে পান না। তিনি স্বীকার করছেন ধর্মের অস্তিত্ব। ধারকের অস্তিত্ব। ধ্রুবকের অস্তিত্ব। ধ্বনি থাকলে ধ্বনির ধারক আছেন। 'ওঁ' থাকলে ওঁকারনাথ আছেন। 'প্রণব' থাকলে প্রণবানন্দ আছেন। তারে বিদ্যুৎ থাকলে কোথাও না কোথাও বিদ্যুৎ কেন্দ্র আছে। চৈতন্যে ভরা বিশ্ব থাকলে সর্ব চৈতন্যের অধীশ্বর চিৎশক্তিময় সচ্চিদানন্দ ঈশ্বর নিশ্চয়ই আছেন।

প্রশ্ন-২। ঈশ্বর সাকার না নিরাকার?

উত্তর : ঈশ্বর সাকার এবং নিরাকার দুই-ই। তিনি মূর্ত এবং অমূর্ত উভয়রূপেই প্রতিভাত হতে পারেন। তিনি স্বরূপ এবং অরূপও। শুধু ঈশ্বর কেন সৃষ্টির সব কিছুরই সাকার এবং নিরাকার দুই-ই। জল পরমাণুরূপে নিরাকার। কিন্তু মেঘ, বৃষ্টি, শিলা, বরফরূপে সাকার। আগুনকে আমরা যখন স্ফুলিঙ্গ রূপে জ্বলতে দেখি তখন তা সাকার। আবার আগুন যখন পাথরে, কাঠে, দেশলাই কাঠিতে চুপ হয়ে লীন, শান্ত হয়ে থাকে তখন তা নিরাকার। দেহ শরীররূপে সাকার আবার সেই শরীর যখন মৃত্যুর পর ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম হয়ে অবস্থান করে তখন তা বস্তুত নিরাকার।

সেজন্য ঈশ্বর বলছেন, যাঁরা আমাকে অব্যক্ত জানেন তাঁরা ঠিক জানেন না। যাঁরা আমাকে ব্যক্তরূপে জানেন তাঁরাও ঠিক জানেন না। তাহলে কারা তাঁকে ঠিক করে জানেন? যাঁরা জানেন যে তিনি ব্যক্ত ও অব্যক্ত দুই ভাবেরই ভাবী। এজন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতার চতুর্থ অধ্যায়ের একাদশ শ্লোকে বলেছেন–

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম।"

অর্থাৎ যে আমাকে যেভাবে ভজনা করে, অর্চনা করে, আমি তাকে সেই ভাবেই সন্তুষ্ট করি। নিরাকারভাবে ভজনা করলে আমি নিরাকারী। সাকারে ভজনা করলে আমি সাকারই। আমি ভক্তের ভগবান। ভক্তের সাধ আমাকে পূরণ করতেই হয়।

ইসলাম ধর্মে যেখানে সাকারের বিরুদ্ধে এত রণদামামা সেখানেও দেখি আল্লাহ বলছেন—আমি স্বপ্রকাশ ও গুপ্ত দুই-ই।

পবিত্র কোরান শরিফের সুরা 'হাদীদের' তিন নম্বর আয়াত-এ বলছে–

"হু অল আউ হ্যল অল আ–
খিরু অজ জা
হিরু অল বা
ত্বিন, অহুঅ বিকুল্লি শাইয়িন আলীম"

অর্থাৎ তিনিই আদি। তিনিই অনন্ত। তিনি স্বপ্রকট। তিনি গুপ্ত। তিনি প্রত্যেক বিষয়ে মহাজ্ঞানী। তিনি স্বপ্রকট। তিনি স্বেচ্ছায় প্রকটিত হন, স্ব-ইচ্ছায় অব্যক্ত হন। অর্থাৎ তিনি সাকার ও নিরাকার দুই ভাবেরই ভাবী।

আর যদি ঈশ্বরকে সর্বশক্তিমান, ইচ্ছাশক্তিময় বলে মনে করি তাহলে তিনি ইচ্ছা করলে আকার ধরতে পারেন না, বা ইচ্ছা করলে নিরাকার হতে পারেন না এই গণ্ডীতে বাঁধলে ঈশ্বরের ক্ষমতাকে কি ছোটো করা হচ্ছে না? যদি ঈশ্বরকে সর্বশক্তিমান বলে মেনে নিই তাহলে যুক্তির খাতিরে, সত্যের খাতিরে মেনে নিতে হবে তিনি সাকার ও নিরাকার দুই-ই হতে পারেন এবং হনও। নাহলে দুই রূপ থাকবে কেন? ব্রহ্মরূপে তিনি নিরাকার। পূর্ণ অবতার রূপে তিনি আকার। অবতার রূপে ঈশ্বরের মানবত্ব ও মানবের ঈশ্বরত্ব প্রকটিত হয়।

প্রশ্ন-৩। আচ্ছা, এই যে এ প্রদেশে ও প্রদেশে—অতীতে এসেছেন, এখনও আসছেন এবং হয়তো বা ভবিষ্যতেও আসবেন এত অবতার পুরুষ এঁরা কি সত্যিই অবতার পুরুষ?

এঁদের আবার অনেকের শিষ্য এবং ভক্তেরা বলেন যে তাঁদের গুরু বা আচার্য হলেন পুরুষোত্তম—শ্রেষ্ঠ অবতার। পরমব্রহ্ম। এত পুরুষোত্তম একসঙ্গে কীভাবে হয়?

উত্তর : খুব কঠিন এবং জটিল প্রশ্ন। হ্যাঁ, বহু সম্প্রদায়ের মধ্যে এই দাবী আছে। এবং সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে এ নিয়ে বাকবিতণ্ডা, যুক্তি প্রতি-যুক্তি, মতান্তর এমনকি মনান্তরও আছে। জনমানসে এ নিয়ে বিভ্রান্তিও কম নেই।

আমরা এ বিতর্কের নিরসন করবার চেষ্টা করবো চূড়ান্ত দর্শন গীতার বক্তব্য দিয়ে। এ বিষয়ে কী বলছে মহাশাস্ত্র গীতা—

"যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমঅধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।।
পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।।"

চতুর্থ অধ্যায়, জ্ঞানযোগ, শ্লোক ৭-৮

অর্থাৎ হে ভরতবংশীয় অর্জুন, যখন যখন ধর্মের গ্লানি উপস্থিত হয়, অধর্মের অভ্যুত্থান ঘটে, তখন আমি নিজেকে সৃজন করি। কেন নিজেকে সৃজন করি? না, অন্যান্য উদ্দেশ্যের সঙ্গে মূলত তিনটি প্রধান উদ্দেশ্য। কী সেই উদ্দেশ্য ভগবানের?

(এক) দুর্বৃত্ত দুরাত্মাদের হাত থেকে সাধু, মহাত্মা ও ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিদের রক্ষা করা।

(দুই) দুবৃত্তদের শুধু নাশ নয় বিনাশ অর্থাৎ বিশেষরূপে নাশ বা ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে। যাতে তারা সমূলে ধ্বংস হয়।

(তিন) এবং ধর্মের স্থাপন নয়, সংস্থাপন অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে স্থাপন করার মানসে আমি জন্মাই নয়, আমি আত্মমায়াবলে নিজেকে প্রকাশ করি।

এখন দেখার এই অবতার পুরুষরা এই তিনটি মূল উদ্দেশ্য সাধনে কতখানি সফলকাম হয়েছেন। অবতার শব্দের আক্ষরিক অর্থ অবতরণ করা। কোথা থেকে অবতরণ করা? না, অরূপ থেকে স্বরূপে। ভূমা থেকে ভূমিতে। ব্রহ্মলোক থেকে জীবলোকে। কোনো গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ভুক্ত না হয়ে একেবারে নিরপেক্ষ ও সত্যপেক্ষ হয়ে আলোচনা করতে হবে এই তিনটি মূল উদ্দেশ্য সাধনে কার কতখানি অবদান। যাঁর অবদান যতখানি তিনি তত বড়ো অবতার। যিনি ধর্মপ্রাণ ও ধর্মাত্মাদের রক্ষা করেছেন। দুষ্টের দমন করেছেন ও ধর্মের স্থাপন শুধু নয় সংস্থাপন করছেন—অর্থাৎ ধর্মকে তার পূর্ব মর্যাদায় পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছেন তিনি নিশ্চয়ই পুরুষোত্তম। অবিনাশী পুরুষ, অব্যয়াত্মা।

আর যদি দেখা যায় কোনো অবতার পুরুষ এই তিনটির কিছু কিছু অংশ সমাধান করেছেন বা কোনো একটাই পুরোপুরি স্থাপন করেছেন। তাঁদের প্রতি পূর্ণ আস্থা রেখে বলতে হয় তিনি পূর্ণ অবতারের দাবি করতে পারেন না। তিনি হয়তো অংশীপুরুষ। সিদ্ধপুরুষ। উত্তম পুরুষ, কিন্তু কোনোভাবেই পুরুষোত্তম নন।

ইতিহাস বলে, ভারতবর্ষ ইংরেজ শাসনে আসার আগে প্রায় পাঁচশত পঁয়ষট্টিটি (৫৬৫) অঙ্গরাজ্যে বিভক্ত ছিল। এঁদের অনেককে এদের সভাসদ বা স্থাবকরা রাজাধিরাজ, রাজচক্রবর্তী, সসাগরা ধরিত্রীর অধিপতি বলে বর্ণনা করেছেন। এবং তা করেছেন হয়তো বা ভয়ে নয়তো বা আবেগের আতিশয্যে। অবতার পুরুষদের ক্ষেত্রে তেমনই ঘটেছে বলে মনে করেন প্রাজ্ঞজনেরা। তাঁরা বহুজন হিতায় বহুজন

সুখায় কাজ করেছেন। হয়তো বা তাঁদের কাজের সেই সুফল যুগ যুগ ধরে অথবা বহুকাল ধরে মানুষকে অমৃতের স্বাদ দেবে। আনন্দের স্বাদ দেবে। তাঁরা নিশ্চয় অনেকে আনন্দময় পুরুষ কিন্তু সচ্চিদানন্দ নন। তাঁরা অবতার পুরুষ বটে কিন্তু পূর্ণ অবতার নন। তাঁরা ভক্তের ভক্তিভাজন কিন্তু ভক্তের ভগবান নন।

প্রশ্ন-৪। ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে সম্পর্ক ঠিক কীরূপ?

উত্তর : ভক্ত ও ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক স্বার্থের। লেনদেনের। দেনাপাওনার। হ্যাঁ, শুনতে অবাক লাগলেও ঠিক তাই। তবে এই স্বার্থ, এই লেনদেন, এই দেনাপাওনা মোটেই সাংসারিক দৃষ্টিভঙ্গিতে নয়। জাগতিক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিচারে বিচার্য নয়। এ সম্পর্ক অতীন্দ্রিয় সম্পর্ক। এ সম্পর্ক আনন্দের সম্পর্ক। এ সম্পর্ক রসের সম্পর্ক। ঈশ্বর সম্বন্ধে বলা হয় 'রসো বৈ সঃ'। অর্থাৎ তিনি রসস্বরূপ। আনন্দস্বরূপ। লীলাময়স্বরূপ। ভক্ত না থাকলে তাঁর লীলার খেলা, রসের খেলা জমবে কীভাবে।

তাইতো রবীন্দ্রনাথ লিখছেন—

"আমি নইলে ত্রিভুবনেশ্বর তোমার প্রেম হতো যে মিছে"

ভক্ত না থাকলে ভগবান প্রেমরস বিলোবেন কোথায়? কাকে?

ভক্তিশাস্ত্রে ভগবান বলছেন—

"নাহং তিষ্ঠয়ামি বৈকুণ্ঠে,
নাহং, সাধুনাং হৃদয়েচ।"

আমি বৈকুণ্ঠে থাকি না। আমি সাধু-মহাত্মাদের হৃদয়েও থাকিনা। তাহলে কোথায় থাকেন হে ভগবান? "মদভক্ত যত্র তিষ্ঠতি অহং তিষ্ঠয়ামি তত্র"। যেখানে আমার ভক্ত থাকে আমি সেখানেই থাকি। ভক্ত এবং ভগবানের মধ্যে চলছে এই নিত্য লীলাখেলা। এই নিত্য রাসলীলা।

আবার এক জায়গায় তিনি বলছেন—

"যে করে আমার আশ
প্রথমে করি তার সর্বনাশ
পরে হই তার দাসানুদাস।।"